নাগরিক আবেদন
দীপশিখা দাস

একটি নাগরিক আবেদন

সামাজিক মাধ্যমে বিচরণরত বন্ধুবান্ধবদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বিষদে জানাতে চাই। এর মধ্যে কোন নান্দনিকতার পরশ নাই। এটি বস্তুত এক ভয় জর্জরিত রোমহষর্ক অভিজ্ঞতার আখ্যান মাত্র। সাধারণ মানুষ শ্রবণ মাত্রেই শিউরে উঠবেন, বলাই বাহুল্য। বিগত দু'ই দশকের কিছু বেশি সময় ধরে মুখ্যত আমি তিলোত্তমা মহানগরী কলকাতার অধিবাসী। সেই সুবাদে এখানকার লৌকিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে আমার একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের বিশাল দেশে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল মূলত এই শহর থেকেই। কালের অন্যতম কবি, সাহিত্যিক, প্রজ্ঞা, মনীষাদের সম্মিলিত কর্মভূমি। দেশের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের পূর্বে এখানেই ছিল প্রধান প্রধান সব কাছারিবাড়ি। এখান থেকেই পরিচালিত হত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ইতিহাসের অজস্র ঘটনার সাক্ষী আজও বহন করে চলেছে এই মহানগর। ক্লাইভ হাউসের খননকার্য এই জনপদের প্রাচীনত্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলমোহর বসিয়েছে। এখানে মিশ্র সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হলেও বাঙালিয়ানার ছাপ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। সময়ের শাসন কখনও কখনও চেনা পরিবেশকেও অচেনা করে তোলে। কিছুদিন আগে আমিও তেমনই একটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার মনের গভীরে স্থায়ীভাবে আতঙ্কের একটা কালো ছায়া বিছিয়ে গেছে। এটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার অর্থ মূলত সবাইকে সচেতন করে দেওয়া। আগে থেকে সুরক্ষায় সম্যক বলয়ে নিজেকে আবদ্ধ

করে ফেলতে পারলেই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। এই পন্থার অবলম্বনে চলার পথে ধেয়ে আসা অনভিপ্রেত ঘটনাগুলোর প্রাদুর্ভাব যথাসম্ভব স্তিমিত হবে।

দিনটা ছিল অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ। ২০২৫ সাল। মাসের শেষ বুধবার। দিনের উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা দিনমনি সূর্য তখন দিগন্তরেখার অবগুণ্ঠন ছেড়ে মধ্যগগন চুম্বনের অভিপ্রায়ে বিহ্বল। কর্মচপল কলকাতা যানবাহনের ভুঁ-ভাঁ'য় মুখরিত। মেয়ের বিদ্যালয়ে তখন ছুটির ঢং ঢং ঘণ্টা বাজার সময় আসন্ন। রবীন্দ্রসদন চত্বরের ব্যস্ততম সড়কপথের সীমাস্থ ফুটপাত ধরে আমি দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলার চেষ্টায় রত ছিলাম। মেট্রো স্টেশান থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথের ধারেই আমার মেয়ের বিদ্যালয়। সেখানেই যাচ্ছিলাম মেয়েকে বাড়িতে ফেরত আনার জন্য। স্কুলের বাস ডিপো থেকে প্রধান ফটক মাত্র কয়েক পা। ছুটির ঘণ্টা বাজার আগেই অভিভাবকেরা ফটকের সামনে ভিড় জমান। তাদের কলরবে জায়গাটা কিছু সময়ের জন্য গমগম করে। গোড়ালিতে চোট থাকায় সেদিন স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। রাস্তাটাকে অজগরের অন্তহীন লেজ মনে হচ্ছিল। নির্ধারিত সময়ে খুলে যায় বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। আমি তখনও স্কুলের বাস ডিপোর কাছে পৌঁছতে পারিনি। অভিভাবকরা সম্ভবত সিংহদুয়ার গলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলেন। চলার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠছিল। ভিতরে একটা চোরা দুশ্চিন্তার আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। মেয়ে শ্রেণিকক্ষ থেকে বেড়িয়ে অভিভাবকদের ভিড়ে আমাকে খুঁজবে। মনে হতাশা নিয়েই লেংচে লেংচে এগিয়ে চললাম। বাসডিপো থেকে গেটের সামনে যাওয়ার পথটা তখন অনিবার্য কারণবশত জনশূন্য। দিনের আলো থাকলেও প্রতিদিনের চেনা জায়গাটা তখন যেন আমার কাছে বেশ খানিকটা অচেনা।

কারণ আর পাঁচটা দিন আমি এই জায়গাটাকে লোকজনের ভিড়ে গমগম করা দেখতেই অভ্যস্ত। মনে কিছুটা অস্বস্থি পুষে রেখেই জনহীন রাস্তাটা দিয়ে এগোচ্ছিলাম। কয়েকটা পদক্ষেপ ফেলার পরেই দু'টো বেশধারী বহুরূপী চোখে পড়ল। এই ধরণের বহুরূপী দেখার অভ্যাসটা আমার সেই ছোটবেলা থেকেই। চৈত্রের গাজন থেকে জৈষ্ঠ্যের খরার মধ্যবর্তী সময়ে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বহুরূপীরা টুঁ দিতেন। শিশু, কিশোর থেকে বৃদ্ধ-বনিতাদের চোখেমুখে এঁকে দিতেন মনোরঞ্জনের রঙিন আলপনা। বিনিময়ে কিছু পাওনা জুটতো তাদের ঝুলিতে। কাজেই এদের প্রতি একটা অন্যরকম ভালোলাগা বরাবরই আমার অন্তরে জাগরূক ছিল। বিদ্যালয়ের প্রায় মুখোমুখি পৌঁছে গেছি; এমন সময় একটা সরু প্যাসেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার যাত্রাপথ আটকে দিলেন একজন বহুরূপী। মাথায় উসকোখুসকো চুলের জটা, হাতে ত্রিশূল, পরনে বাঘছাল, গলায় হরিতকির মালা, মুখে বাহারি রঙ। দেবাদিদেব মহাদেবের বেশভূষায় সে সুসজ্জিত। আমি থমকে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে মহাদেবের রুদ্র অবতার হনুমানের বেশে থাকা বহুরূপী আমার ঠিক পিছনে এসে ফেরার পথ রুদ্ধ করেছেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি বিরক্তিকর পরিমণ্ডল যেন চারদিক থেকে আমাকে মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ফেলল। হাতে থাকা টাকার ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। মহাদেবের বেশধারী বহুরূপীটা বিনয়ের সুরে আমার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। আবেদনটা ছিল মাত্র দু'টো টাকার। সম্বোধনের ভাষা ছিল হিন্দি। প্রত্যাশা মতোই আমি ব্যাগ থেকে দু'টো টাকা বের করে তাকে দিই। ফের আরেকটা দাবি আমার দিকে ধেয়ে এল। কতকটা অদ্ভুত বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমার মানিব্যাগটা তার ঝুলিতে রাখা দেবতার গায়ে ঠেকাতে হবে। হঠাৎ করে আমার শরীরে বহমান রক্তের চাপ যেন চরচরিয়ে বেড়ে গেল। মনের আকাশে ছেয়ে গেল দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নিচে নেমে গেল। ভীষণ ভয় পেয়ে যেন ঈষৎ কুঁকড়ে

গেলাম। এদিকে-ওদিকে মুখ ফেরালাম বটে কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখলাম না যে হঠাৎ বিপদের মুখে সাহায্য চাইব। ভয় জড়ানো কণ্ঠে বললাম, " আমার এতো আশীর্বাদের দরকার নেই। রাস্তা ছাড়ুন। দেরি হচ্ছে।" এতে তাদের কোন অভিব্যক্তি নেই। একইভাবে দু'জনে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি নিরুপায় হয়ে ব্যাগ থেকে আরও ২০ টাকা বের করি। মহাদেবরূপী বহুরুপী সেই নোটটা আমার হাত থেকে পলকের মধ্যে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। ভেবেছিলাম এটা পেয়ে পথ ছেড়ে দেবে। ক্ষণিকের মধ্যে আমার ভুল ভাঙল। তার ভাষার মধ্যে অনমনীয় ও ক্রুর ভাবটা আরও বেশি মাত্রায় ফুটে উঠল। হাতের ব্রেসলেটটা খুলে দেবতার চরণে ঠেকাতে বললেন। আমাকে নির্বিকার দেখে দু'জনে একই কথা বার বার আওড়াতে লাগলেন। এদের কাণ্ডকারখানায় তখন আমি রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি যদিও সেখানে শীতের উত্তুরে বাতাস বইছিল। রুখে না দাঁড়ালে বোধহয় টেকা সম্ভব হত না। সমস্ত সাহসকে একত্রিত করে ফুঁসে উঠলাম, "আমার কোন আশীর্বাদের দরকার নেই। দেবতার নাম নিয়ে মানুষের সাথে ভণ্ডামি শুরু করেছ? দেখবে এখুনি স্কুলের সিকিউরিটি দাদাদের ডেকে তোমাদের ফাজলামি বের করে দেব। এখন পথ ছাড়ো। তাড়া আছে। আমাকে যেতে দাও।" হঠাৎ এমন ঝাঁঝালো বাক্যবাণের আকস্মিকতায় ওরা হয়ত ক্ষণিক বেসামাল হয়ে পড়েছিল। সামনের বহুরূপীটা একটু সরে দাঁড়াতেই পাশের ফাঁক দিয়ে আমি তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ি। ওদের খপ্পর থেকে রক্ষা পেলেও বুকের মধ্যে ধকধকানি হৃদকম্পের রেশটা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল।

খুব সম্ভবত তারা আমাকে দূর থেকেই লক্ষ্য করেছিল। রাস্তাটা হঠাৎ জনশূন্য হয়ে যাওয়া তাদের সামনে একটা বড় সুযোগ এনে দেয়। এমন সময়ে

লেংচে লেংচে ধীর গতিতে চলা আমার মতো একজন অসহায়া তাদের সামনে কার্যসিদ্ধির মহেন্দ্রযোগ নির্মাণ করে, বলাই শ্রেয়। এহেন পরিস্থিতিতে দিনের আলোতেও তারা রাহাজানির মতো কিছু ঘটনোর দুঃসাহস আহরণ করে ফেলে। কলকাতার বুকে ভীষণ ব্যস্ত একটা এলাকায় এমন অনভিপ্রেত কিছু ঘটতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তাদের দুঃসাহস আমার অন্তরে ত্রাসের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। অচিরেই তাদের নিবৃত্ত করা দরকার। জনসুরক্ষার বিষয়টা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। কাজেই প্রশাসনের তরফ থেকে বহুরূপীর বেশে থাকা এসমস্ত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াটা ভীষণ জরুরি। নচেৎ এদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। কোন অসহায়কে সামনে পেয়ে যথাসর্বস্ব হরণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। এতে জনসুরক্ষার ক্ষেত্রটা অনিশ্চয়তার নিকষ অন্ধকারে ডুবে যাবে। ফলত প্রকৃত বহুরূপীরা সন্দেহের আওতায় পড়ে জনরোষের শিকার হতে পারেন। সেদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেও মিণ্টো পার্কের মোড়ে আরও জনা চারেক ওইরকম বহুরূপীকে দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল শুধু ওই দু'জনেই শেষ নয়। এর পেছনে একটা বড় চক্র আছে। বহুরূপী সেজে তারা মহানগরীর অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুশ্চিন্তা আমার ভিতরে চেরে চেরে উঠছিল। সেদিন হয়ত তারা আমার মোবাইল সেট, জুয়েলারি ও টাকার ব্যাগ হাতিয়ে নেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। যাইহোক আমি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছি । বিভিন্ন কাজে মহিলাদের অহরহ বাড়ির বাইরে যেতেই হয়। পথে ঘাটে দিনদাহারে তাদের সাথে অনভিপ্রেত কিছু ঘটে যাওয়া মোটেই কাম্য নয়। স্থানীয় প্রশাসনকে এই বিষয়ে আরও সজাগ হতে হবে। পথচলতি দুস্কৃতি দমনে রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোকে বলিষ্ঠ হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রয়োজনে আরও উন্নতমানের প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। নাগরিক সুরক্ষা যেন কোনমতেই ভূলুণ্ঠিত না হয়। পথঘাটে সুধী

নাগরিকবৃন্দ যেন সুষ্ঠুভাবে সম্ভ্রমের সাথে বিচরণ করতে পারেন। একটা জনকল্যাণকামী রাস্ট্রের জন্য সেটাই কাম্য।

.... ধন্যবাদান্তে,

দীপশিখা দাস

মুনিয়াডিহি, মুর্শিদাবাদ।

১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।